Vol. 5 | No. 1 | 1961

Check for updates

# সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

## ইয়েটস ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ

| | |
|---|---|
| Volume | 5 |
| Issue | 1 |
| Year | 1961 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | সারওয়ার মুরশিদ |
| Published online | June 15, 1961 |
| DOI | 10.62328/sp.v5i1.4 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v5i1.4 |
| Pages | 45-64 |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

Check for updates

# ইয়েট্‌স ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ

**সারওয়ার মুরশিদ**

প্রভাত মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্র-জীবনকথা'য় দুঃখ করে লিখেছেন, 'আশ্চর্য লাগে ভাবতে ইয়েট্‌সের শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর মানসিক আকর্ষণ প্রায় লোপ পেয়েছিল।'[১] এর কারণ সম্পর্কে প্রভাতকুমার আমাদের কোনও আলো দেন নি, এ বইতেও নয়, তাঁর বৃহত্তর 'রবীন্দ্রজীবনী'তেও নয়।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি ইয়েটসের মানসিক আকর্ষণ কেন লোপ পেয়েছিল তা বুঝতে হলে দুই কবির বন্ধুত্বের পশ্চাৎপটের দিকে ফিরে তাকাতে হবে। তাঁদের কবি প্রকৃতি ও কাব্যিক পরিণতির কথা মনে রাখলে এবং সংশ্লিষ্ট সব তথ্য উপস্থিত করলে আশ্চর্য হবার কোনও কারণ থাকবে না।

এ প্রবন্ধে দেখা যাবে যে এক বিশেষ অর্থে, প্রাচ্য জীবনের প্রতীক হিসেবে, ইয়েটসের কাছে রবীন্দ্রনাথের মূল্য শেষ পর্যন্ত অম্লান ছিল, যদিচ রবীন্দ্রনাথের ও প্রাচ্যের চিন্তার কোনও কোনও দিকের প্রতি তাঁর কিছুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। আরও একটি বিষয়ে আমি রবীন্দ্রানুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করব : সেটি হল, যখন ইয়েটস রবীন্দ্রনাথের চিন্তা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করছেন তার কাছাকাছি সময় তাঁর একটি কবিতায় প্রায় রাবীন্দ্রিক অনুভূতি ও চিন্তার আকস্মিক ও বিস্ময়কর উপস্থিতি।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইয়েটসের পরিচয় হয় প্রথম মহাযুদ্ধের দু'বছর আগে। এ সময়টা য়ুরোপীয় সংস্কৃতির এক সঙ্কটকাল। য়ুরোপের মানবতন্ত্রী এবং বিজ্ঞানতন্ত্রী সভ্যতা তখন বিস্ফোরণের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল। এ জটিল সভ্যতার নীচের তলায় ছিল কুটিল ক্ষয়, আর উপর তলায় ছিল কুৎসিত স্বার্থপরতা এবং শূন্যতা। এমন সময় এক অপেক্ষাকৃত সরল অথচ গভীর সংস্কৃতির মর্মস্পর্শী বাণী নিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ। সংশয়দীর্ণ ও হৃত-প্রত্যয় য়ুরোপীয় চিত্ত তাঁর আনন্দিত উপলব্ধি ও গভীর বিশ্বাসে মুগ্ধ হল।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইয়েটসের পরিচয়ের ভূমিকাটি দীর্ঘ করে দেয়ার প্রয়োজন আছে। আয়ার্লণ্ডের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ইতিহাস ইংলণ্ডের থেকে স্বতন্ত্র এবং কোনও কোনও দিক দিয়ে য়ুরোপে অনন্য। তাহলেও উনিশ শতকের শেষ দিকে ও বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে দু'দেশের লেখক ও ভাবুকদের অনেকে একই আধ্যাত্মিক সমস্যায় পীড়িত হয়েছিলেন। যুক্তিবাদ, বস্তুবাদ, প্রত্যক্ষবাদ ও যান্ত্রিক বিজ্ঞান আত্মাকে অস্বীকার করে, সহজ উপলব্ধিকে সংশয়াক্রান্ত করে এবং কল্পনাকে খর্ব করে অধ্যাত্ম জীবনকে শূন্যগর্ভ করে দিয়েছিল। ডারউইনীয় বিবর্তন তত্ত্ব এবং বাইবেলের ঐতিহাসিক সমালোচনার মুখে বিপন্ন, এবং যুক্তিবাদী প্রোটেষ্টাণ্ট মানসিকতার কল্পনাহীন ও অসুন্দর আচার অভ্যাসের বাহন, ইসায়ী ধর্ম এ শূন্যতা অনেক ক্ষেত্রেই পূরণ করতে পারে নি। জীবন ও জগতের সার্বিক ব্যাখ্যা হিসেবে, একই সঙ্গে বুদ্ধি, কল্পনা ও আত্মার আশ্রয় হিসেবে, এ ধর্ম অকেজো হয়ে পড়েছিল—ইয়েটসের ভাষায়, 'এক বাক্স খেলনায় পরিণত হয়েছিল।'

এ আধ্যাত্মিক পরিস্থিতিতে ইয়েট্‌স্ ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হন মোহিনী চট্টোপাধ্যায়ের দৌত্যে। খৃষ্টের মত প্রিয়দর্শন এই ব্রাহ্মণ যুবক গীতা ও শঙ্করাচার্যের বেদান্তের ব্যাখ্যা করে শতাব্দী-শেষের তরুণ ডাবলিন সমাজের কাছে জ্ঞান, উপলব্ধি ও কল্পনার এক নূতন দিগন্ত খুলে দিয়েছিলেন। এ কথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে পরবর্তীকালে যে স্বীকৃতি ও মুগ্ধতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইয়েটসের পরিচয় হয়েছিল, তার ক্ষেত্র অনেকখানি তৈরী করেছিলেন এই দার্শনিক ব্রাহ্মণ। পরিণত বয়সে ইয়েটস বলেছেন, 'এলকিবায়ডিস সক্রেটিসের কাছ থেকে পালিয়ে বেঁচেছিলেন পাছে সব ছেড়ে দিয়ে জীবনভর শুধু তাঁর কথাই শুনতে হয়। আর আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, আমরা তরুণেরা, যারা কর্মে ও চিন্তায় অজানাকে খুঁজেছি, তারা ভেবেছি, শুধু এ মানুষটির কথা শোনা আর পরিশেষে তাঁর মতো ভাবতে পারা জীবনের সার্থকতম কাজ।'[৩] বস্তুতঃ গ্রহণে, প্রতিক্রিয়ায়, বর্জনে ভারতীয় ধ্রুপদী দর্শনের এই ব্যাখ্যাকার কবি ইয়েটসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। মোহিনী চট্টোপাধ্যায়ের বাণী তাঁর স্মৃতিতে, গদ্যে ও কাব্যে সারাজীবন থেকে থেকে অনুরণন তুলেছে।

মোহিনী চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ইয়েট্‌স কি পেয়েছিলেন? তাঁর কাছ থেকে ইয়েট্‌স পেয়েছিলেন এমন এক দর্শন যা 'যুক্তিসহ' এবং একই সঙ্গে 'নিঃসীম'।[৪] এ দর্শনের প্রধান প্রত্যয়, সব কিছুর উৎসমূল আত্মা। এ প্রত্যয়

য়ুরোপীয় সংস্কৃতিতে দুর্বল হয়ে পড়েছিল, আর এ নিশ্চয়তার উপরই তিনি জীবনের ভিত্তি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। ইয়েটসের বন্ধু জর্জ রাসেল বলেছেন, 'ভাগবৎ গীতা' এবং উপনিষদের প্রজ্ঞায় এমন দৈব পরিপূর্ণতা দেখতে পাই যে আমার মনে হয়, এর রচয়িতারা যেন অবিক্ষুব্ধ স্মৃতি নিয়ে কামনাতুর সহস্র জীবনের দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখেছেন, দেখেছেন কায়াহীনের সাথে ছায়ার লোভে মানুষের জ্বরাক্রান্ত দ্বন্দ্ব। নইলে আত্মা যা নিশ্চয় বলে জানে, তা এমন বিশ্বাসের সঙ্গে কি করে তাঁরা বলে যেতে পারলেন?'[৫] ইয়েটস ও রাসেল দু'জনেই এ নিঃসংশয় প্রত্যয়ের উপর সাহিত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। ইয়েটস বলেছেন, 'দার্শনিক কান্টের ধারণায় যে তিনটি জিনিষ না হলে বাঁচা চলে না আমিও সে তিনটি জিনিষের উপর সাহিত্যের ভিত্তিকে দাঁড় করাতে চাই। এরা হল : মুক্তি, ঈশ্বর, অবিনশ্বরতা। বেকন, নিউটন এবং লকের প্রভাবে এ তিনটি জিনিষই ফিকে হয়ে গেছে। সুতরাং সাহিত্যও হয়ে গেছে ক্ষয়িষ্ণু। আইরিশ সাহিত্য তখনই আমাকে আনন্দ দিয়েছে যখন আমি এতে দেখতে পেয়েছি শুধু এ তিনের কোন একটির স্বীকৃতি এবং আর সব কিছুর প্রতি উপেক্ষা। এ সাহিত্য তখনই আমাকে আনন্দ দিয়েছে যখন এতে দেখতে পেয়েছি এমন আবেগ বা বেহিসেবী চরিত্র, যা জরাহীন, মৃত্যুহীন বলে ভাবতে সক্ষম মানব চিত্তের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ।'[৬] এ সব যদিও ইয়েট্সের শেষ জীবনের উক্তি, তিনি এ কথার সাক্ষ্য রেখে গেছেন যে নূতন আইরিশ সাহিত্যের পেছনে যে দর্শন তাতে মোহিনী চট্টোপাধ্যায়ের অবদান অনেকখানি।[৭]

মোহিনী চট্টোপাধ্যায়ের বেদান্ত দর্শনের মধ্যে ইয়েটস আর একটা বড় সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছিলেন। ইয়েটস আজীবন মানবসত্তার ঐক্যের সমস্যা নিয়ে ভেবেছিলেন। এর দু'টো দিক, একটি ব্যক্তির ঐক্য, অপরটি সমাজের ঐক্য। কবি হিসেবে নিজের জন্যে, এবং তাঁর জাতির জন্যে, তিনি একটা দর্শনের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। তিনি এমন একটা কিছু চেয়েছিলেন যা আধুনিক বিজ্ঞানের বিশ্লেষণী প্রক্রিয়ায় শতভাগে ভেঙে যাওয়া ব্যক্তিমনকে আবার এক করবে, যা সব শ্রেণীকে এক বৃত্তে স্থান দেবে এবং জাতির সমস্ত বিচ্ছিন্ন কার্যকলাপকে, অর্থনীতি জাতীয়তা ও ধর্মকে এক আন্তর ছন্দে মিলিত করবে। ইয়েটস আধুনিক মানুষ হিসেবে এমন ধর্ম চেয়েছিলেন যা ব্যক্তির সম্পূর্ণ সত্তাকে পরিতৃপ্ত করবে, ভেতরের জগতের

সঙ্গে সঙ্গে বাইরের জগৎকেও একটী আত্মিক সংহতি দান করবে। এই ঐক্যের সূত্র তিনি দেখছিলেন মোহিনী চট্টোপাধ্যায়ের অসীম বিস্তৃত দর্শনের গভীর চিন্ময়তায়।

কিন্তু ইয়েট্‌স্‌ কবি, তিনি শুধু দর্শন খোঁজেন নি, তিনি দেখতে চেয়েছেন কাব্য এবং জীবনে তার রূপ। 'আমাদের সত্তার যে একটি কালাতীত স্থানাতীত দিক আছে তা' হয়তো আমাদের যুক্তির কাছে আধুনিক দর্শনের কোনও কেতাব স্বচ্ছন্দে প্রমাণ করতে পারবে, তবুও তো দেখতে পাই আমাদের কল্পনা নিসর্গের দাস হয়ে আছে।'[৮] তাই প্রয়োজন স্পন্দিত 'অভিজ্ঞতার'।[৯]

রবীন্দ্রনাথ কোনও কোনও দিক দিয়ে ইয়েটসের এ দাবী মিটিয়েছিলেন। মোহিনী চট্টোপাধ্যায় যে দর্শন থেকে ইয়েটসকে পাঠ দিয়েছিলেন সে দর্শন-লালিত সংস্কৃতির পরমাশ্চর্য প্রকাশ তিনি দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। 'গীতাঞ্জলি'র কবিতায় বেদ-উপনিষদের মর্মোত্থিত প্রত্যয় ও আশ্বাস বাংলা দেশের রোদভরা নিবিড় নীল আকাশের নীচে নূতন করে ধ্বনিত হয়েছিল। এ প্রত্যয়ের অতলতা ও প্রশান্তি ইয়েটসকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথের আবেদন ছিল প্রধানতঃ একটী স্থিতধী এবং সুসম্পৃক্ত সংস্কৃতির আবেদন। যেখানে কিষাণ ও অভিজাত জীবনে তখনও যোগ ছিল এবং দেহ ও আত্মাকে মানুষ আলাদা করে দেখেনি।

ইয়েটস গীতাঞ্জলির ভূমিকায় লিখেছেন: 'ভারতীয় সভ্যতার মত রবীন্দ্রনাথও আত্মাকে আবিষ্কার করে এবং তার মুক্তির কাছে নিজেকে সমর্পণ করেই খুসি।'[৯] 'সারা জীবন আমি যে জগতের স্বপ্ন দেখেছি এ কবিতাগুলোর চিন্তায় দেখতে পাই সেই জগৎ। এগুলো এক পরম সংস্কৃতির কীর্তি, তবুও মনে হয় এগুলো যেন কাশ-দূর্বার সাধারণ মাটি থেকে বেরিয়ে এসেছে। কাব্য ও ধর্ম যাতে মিলে এক হয়ে গেছে এমন একটী ঐতিহ্য, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত থেকে ভাব ও উপমা গ্রহণ করেছে, এবং বিদ্বজ্জনের ও আমীরের চিন্তাকে আবার পৌঁছে দিয়েছে জনতার কাছে। যদি বাংলার সভ্যতা ভেঙে না যায়, যে মন সবার মধ্যে অন্তঃশীলা তা যদি আমাদের মনের মত ভেঙে খান খান হয়ে না যায়, তাহলে কয়েক যুগের মধ্যে এদের সূক্ষ্ম সৌকর্যের কিছু না কিছু পথস্থিত ভিক্ষুকদের কাছে গিয়ে পৌঁছবে।'[১০]

কিন্তু য়ুরোপীয় হিসেবে ইয়েটস সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেহ ও আত্মার অনায়াস মিলন দেখে।

Entering my heart unbidden even as
one of the common crowd, unknown to me,
my king, thou didst press the signet
of eternity upon many a fleeting moment.[১১]

ইয়েটস 'গীতাঞ্জলি'র এ লাইন ক'টির উপর মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেছেন: 'এ পবিত্রতার অনুভূতি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের ধর্ম-চর্চার অনুভূতি নয়, কিংবা কশার সাহায্যে আত্মনিগ্রহ জনিত অনুভূতি নয়। এ যেন ধূলো আর সূর্যালোকের ছবি আঁকেন, এমন কোনও শিল্পীর অনুভূতি—শুধু তীব্রতর হয়ে উঠেছে এই যা। এ কণ্ঠ শুনতে হলে আমরা যাই, যাঁরা আমাদের হিংসাপূর্ণ ইতিহাসে নেহাতই বিদেশীর মত, সেই সেণ্ট ফ্রান্সিস আর ব্লেকের কাছে।'[১২] মোহিনী চট্টোপাধ্যায় তরুণ ইয়েটসকে বলেছিলেন: 'শিশুদের শেখাও এ দেহ তাদের নয়'; আবার, 'এ দেহ-ই ব্রাহ্মণ।'[১৩] পরে ইয়েটস 'গীতাঞ্জলি'তে পড়লেন:

Life of my life, I shall ever try to keep
my body pure, knowing that thy
Living touch is upon all my limbs.[১৪]

যা ছিল তত্ত্ব কবির অভিজ্ঞানে তা উপলব্ধ সত্যের প্রত্যক্ষতা লাভ করল। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় দর্শনের মর্মকথা ইয়েটসের কাছে মোহিনী চট্টোপাধ্যায়ের চেয়ে অনেক বেশী প্রাণস্পর্শী করে উপস্থিত করেছিলেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

আধুনিক কালের খণ্ডিত সমাজ, খণ্ডিত কালচেতনা, এবং খণ্ডিত জ্ঞানের জন্য ইয়েটস যতখানি ক্লিষ্ট বোধ করেছেন, রবীন্দ্রনাথের জীবনের এবং তাঁর সংস্কৃতির স্বতঃস্ফূর্ত ঐক্য দেখে তাঁর প্রতি ঠিক ততখানি আকৃষ্ট বোধ করেছেন। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ ইয়েটসের মতো নিজ দেশের সংস্কৃতি ও চিন্তাক্ষেত্রের নায়ক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আভিজাত্যও ইয়েটসের ভালো লাগার কথা। আরও একটি কারণ সম্ভবতঃ দুই কবির সখ্যের সহায়ক হয়েছিল। ভারতের আধ্যাত্মিক গৌরব এবং তার রাজনৈতিক পরাধীনতার মধ্যেকার ব্যবধানটি আয়র্লণ্ডের জীবনেও ছিল। ইয়েটস ভারতবর্ষ ও আয়র্লণ্ডের মধ্যে কি আধ্যাত্মিক মিল দেখেছিলেন তা প্রসঙ্গান্তরে আলোচিত হবে।

১৯৩২ সালে শ্রীপুরোহিত স্বামী নামে এক ভারতীয় সন্ন্যাসীর আত্মজীবনীর ভূমিকায় ইয়েটস লিখেছেন ঃ 'আমি রবীন্দ্রনাথের সুন্দর কাব্য গ্রন্থ 'গীতাঞ্জলি'র জন্যে একটি ভূমিকা লিখেছিলাম, আর আজ বিশ বছর পর এমন একটি গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যা সমান গুরুত্বের বলে পরিগণিত হতে পারে।'[১৫] ইয়েটসের এ ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয় নি। ইংলণ্ডেও বইটি প্রায় অজ্ঞাত। তাহলে ইয়েটস এ বই সম্পর্কে এমন বিস্ময়কর মন্তব্য করেছিলেন কি করে? পুরোহিত স্বামী পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তিনি ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার গুপ্ত ও রহস্যময় দিকের, শ্রদ্ধাহীনেরা বলবেন আষাঢ়ে দিকের, প্রতিভূও ছিলেন। স্বামীজীর আত্ম-জীবনীটি অনেক অলৌকিক ঘটনায় পূর্ণ, এ বইয়ের সঙ্গে 'গীতাঞ্জলি'র তুলনায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যখানির যে মূল্যায়ন প্রকাশ পেয়েছে তা সম্ভব হয়েছে ইয়েটসের মনের কৌতূহলোদ্দীপক ইন্দ্রজাল ও অলৌকিক প্রীতির জন্যে। এ কথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যে আলোর চেয়ে অন্ধকারময় রহস্যের প্রতি ইয়েটসের কম অনুরাগ ছিল না। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে অশরীরী যোনীর অস্তিত্ব বিষয়ে ইয়েটসের মনোভাবটি খুব সরল নয়।

ইয়েটস পুরোহিত স্বামীর গ্রন্থের ভূমিকায় আরো লিখেছেন, কি করে আইরিশ প্রোটেষ্টান্ট দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে লেডি গ্রেগরি এবং তিনি, আয়র্লণ্ডের অলৌকিকে বিশ্বাসী অজ্ঞ জনসাধারণের দেখা হুরপরীর কাহিনী সংগ্রহে ব্যাপৃত হয়েছিলেন। এই অনুসন্ধানের ফলে তাঁরা এসে উপনীত হয়েছিলেন 'এক ঝাপসা অন্ধকারের মধ্যে, এমন এক গর্ভাশয়ের মধ্যে যা থেকে সব কিছুর উৎপত্তি, এমন এক অবস্থার মধ্যে, "যেখানে উল্লাস ও যন্ত্রণা এবং কুকুর আর ঘোড়ার দেখা অপচ্ছায়া" যেন একই জায়গাতে স্থান পেয়েছে।'[১৬] কিন্তু সব সময় কবির মনে হয়েছে কী যেন একটা পাওয়া যাচ্ছে না। আর সে জিনিষটি নিয়ে এলেন পুরোহিত স্বামী। তাঁর 'ব্যাখ্যাকারী বুদ্ধি' এ অন্ধকারের বার্তাবাহী খণ্ড খণ্ড তথ্যগুলোকে এক প্রাচীন দর্শনের সূত্রে গ্রথিত করে ইয়েটসের মনকে তৃপ্ত করল।[১৭] আর এ অন্ধকারের সেতু দিয়ে আয়র্লণ্ড ও ভারতবর্ষ ইয়েটসের চিন্তা ও কল্পনায় মিলিত হল। পুরোহিত স্বামীর সহযোগিতায় ইয়েটস শুধু যে উপনিষদের তরজমা করেছিলেন তা নয়, পাতঞ্জলি-নির্দেশিত যোগ-প্রক্রিয়া এবং তান্ত্রিক রহস্য বিষয়েও অনেক জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

ইয়েটস ধীরে ধীরে ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করেছিলেন এবং তিনি এ আবিষ্কার সম্পূর্ণ করেছিলেন পুরোহিত স্বামীর সংস্পর্শে এসে। এ দীর্ঘ পরিচয়ের ইতিহাসে ইয়েটস রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব একটী ক্ষুদ্র ঘটনা মাত্র, এবং শেষ জীবনে যখন তিনি উপনিষদের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন তখন রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রতি তাঁর অনুরাগ অনেকখানি হ্রাস পায়। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে শুধু এ কারণেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি ইয়েটসের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছিল। এখানে ১৯৩৫ সনে রোদেনষ্টাইনের কাছে লিখিত ইয়েটসের একখানি চিঠি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; 'জাহান্নামে যাক রবীন্দ্রনাথ। ষ্টার্জ মূর আর আমি মিলে তাঁর তিনখানি সুন্দর বই বের করেছিলাম; তারপর তিনি বড় কবি হওয়ার চেয়ে ইংরেজী ভাষা জানাকে অনেক বড় জ্ঞান করলেন, আর ছাপলেন ভাবুকতার ভাপে ভরা জঞ্জাল; এবং এ করে নিজের খ্যাতিকে নষ্ট করলেন। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী জানেননা, কোনও ভারতীয় ইংরেজী জানে না। যে ভাষা শৈশবে শেখা হয়নি, এবং তখন থেকে চিন্তার বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি, সে ভাষায় গীতময়তা বা বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কেউ কিছু লিখতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে আমি আবার ফিরে আ'সব, তবে এখন নয়—ফিরে আসব এ কারণে যে সম্প্রতি তিনি ইংরেজীতে কয়েকটি অতি সুন্দর গদ্য রচনা প্রকাশ করেছেন যা তাঁর কবিখ্যাতি অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ায় উপেক্ষিত হয়েছে।'[১৮] আর ১৯১২ সালে ইয়েটস রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত অনুবাদের জন্যে তাঁকে ইংরেজী ভাষার কবি হিসাবে তাঁদের 'সংসদে' নির্বাচন করার জন্য বৃটিশ বন্ধুদের কাছে ওকালতি করেছিলেন।[১৯]

কিন্তু ইয়েটসের কবি প্রকৃতি এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিরোধ এবং প্রতীচ্যের কবির প্রাচ্যের কবির প্রতি অসন্তোষের কারণ সম্পর্কে বিশেষ আলো পাওয়া যায় জোসেফ হোন লিখিত ইয়েটস জীবনী থেকে। ১৯৩৭ সালে একজন ভারতীয় অধ্যাপক ও ট্রিনিটি কলেজের ডক্টর ট্রেঞ্চ এবং ইয়েটসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এবং ভারতবর্ষ বিষয়ে একটী তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা হয়। এ আলোচনায় নাটকীয়তা ছিল ঃ

> ইয়েটস উত্তেজিত ছিলেন। তিনি এ বলে কথা শুরু করলেন, 'আমার বন্ধু রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরকে নিয়ে বড্ড বেশী লেখেন। তাঁর এ সব রচনার অস্পষ্টতায় আমার রাগ ধরে। আরেক রকম মরমিত্ব কাব্যের ক্ষতি করে। তা হল পিটার বেল এবং প্রিমরোজ ঘটিত মরমিত্ব।' ডক্টর ট্রেঞ্চ বললেন, 'কিন্তু শিলার উপরের

> প্রিমরোজগুচ্ছ নিয়ে ওয়ার্ডযোওয়ার্থের কবিতাটি সম্পর্কে আপনি কি বলবেন ? ফুল বৃন্তে, বৃন্ত পাথরে, পাথর বসুধায় সংলগ্ন, বসুধা তার মণ্ডলে নিষ্ঠ, এবং ঋতুর সব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সব কিছুর উপর বিধাতা।' ইয়েট্স এ প্রচ্ছন্ন তিরস্কার অগ্রাহ্য করে বললেন; 'আমি সারাজীবন উপনিষদের দর্শন থেকে প্রাণরস গ্রহণ করেছি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মরমিত্বের একটা দিক আছে যা আমি অপছন্দ করি। ভারতীয় কাব্যে আমি ট্র্যাজেডী দেখতে পাই না। আর ভারতীয়দের লেখা উচিত উর্দু কিংবা বাংলায়।' অধ্যাপক বসু জবাব দিলেন, 'আমাদের সমস্যা দ্বন্দ্বে প্রবেশ করা নয়, দ্বন্দ্ব থেকে বেরিয়ে আসা।' ইয়েটস আরও বললেন, অক্সফোর্ডে ভারতীয়দের আলাপ করবার সময় মাত্র একজনকে দেখেছি যিনি ইংরেজীতে নিজকে প্রকাশ করার চেষ্টাকে ঘৃণা করতেন। তার কারণ সে ব্যক্তি ছিলেন নেপালী, তাই কখনও স্বাধীনতা হারাননি বা জোয়ালে মাথা লাগান নি। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী ছেড়ে দিন।' অধ্যাপক বসু বললেন, 'প্রশ্নটি জটিল। হিন্দু মুসলমানের ভিন্ন ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া করতে হচ্ছে। আপনি ভারতবর্ষের জন্যে একটি বাণী দিতে পারেন ?' 'এ পক্ষের এক লক্ষ লোক অপর পক্ষের এক লক্ষ লোকের সম্মুখীন হোক। বিরোধের উপর জোর দিন, ভারতের প্রতি এই আমার বাণী।' এরপর ইয়েটস দ্রুত বেগে ঘরের একদিকে গেলেন এবং সাটোর[২০] তরবারিটি নাটকীয় ভঙ্গিতে কোষমুক্ত করে চীৎকার করে বললেন, 'চাই দ্বন্দ্ব, আরও দ্বন্দ্ব।'[২১]

উপরের উদ্ধৃতি ইয়েটসের কাব্যিক রুচি ও মেজাজকে চিহ্নিত করছে এবং জীবন চেতনার দিক দিয়ে তাঁর ও রবীন্দ্রনাথের ব্যবধান যে যোজন যোজন তা প্রমাণ করছে। সম্ভবতঃ ইয়েটস রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরানুভূতিতে অস্পষ্টতা ছাড়াও তাগিদহীনতা অভ্যাস ও ভাবালুতা দেখতে পেয়েছেন। এখানে লক্ষ্য করার মত যে ইয়েটস উপনিষদের একজন অনুরক্ত পাঠক, এ কথা তিনি জোরের সাথে ঘোষণা করছেন। তিনি বোঝাতে চাইছেন যে উপনিষদে এমন গুণ আছে যা তিনি রবীন্দ্রনাথে দেখতে পান না। উপনিষদের অনেক গুণের মধ্যে এ গুণটি যে কি তার কিঞ্চিৎ ধারণা হয় ইয়েটসের এক আলোচনায় ঈশ উপনিষদ থেকে উদ্ধৃত ক'টি লাইন থেকে। ১৯৩৬ সালে আধুনিক ইংরেজী কাব্য বিষয়ে এক বেতার বক্তৃতায় ইডিথ সিটওয়েলের 'Ass Face' কবিতাটির আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন ঃ

> গভীর দর্শনের সৃষ্টি ভয় থেকে। পায়ের তলায় অতলস্পর্শ গহবর উন্মোচিত হয়, আর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সমস্ত পূর্ব ধারণা...এর অতলে বিলীন হয়। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সেই প্রাচীন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেই হবে ঃ সত্য

কোথাও আছে কি? ঈশ্বর আছেন কি? আত্মা আছে কি? আমরা ভারতের পবিত্র গ্রন্থের মত উচ্চকণ্ঠে বলে উঠি: 'ওরা সোনার ছিপি দিয়ে বোতলের মুখ বন্ধ করছে; ওটা খুলে ফেল। সত্যকে মুক্ত কর'।[২২]

• ইয়েটস রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবোধে এ তীব্রতা, তাঁর দার্শনিক কবিতায় 'হৃদয়রক্ত মথিত করা এ জাতীয় কোনও জিজ্ঞাসা দেখতে পান নি। এবং পাওয়ার কোনও কারণও নেই। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতার দুর্বল দিকের যে সমালোচনা ইয়েটস করেছেন তার যথার্থতা মেনে নিলেও এখানে স্মর্তব্য যে সংশয়াকুল হৃত-ঐতিহ্য আধুনিক য়ুরোপীয়দের মত বিশ্বাস আবিষ্কারের জন্য রবীন্দ্রনাথের নূতন করে আদিম পৃথিবীর শূন্যতার ও ত্রাসের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় নি। কোনও অবিশ্বাস তাঁর বিশ্বাসে কোনও দিনই ফাটল ধরাতে পারে নি, যেমন ধরিয়ে ছিল জেরার্ড ম্যানলি হপকিন্সের ক্ষেত্রে। কোনও সংশয় বা বিরুদ্ধ চেতনার সঙ্গে তাঁকে যুঝতে হয় নি। অনিশ্চয়তার কালো গহ্বরে ঐতিহ্যলব্ধ ধারণা বিসর্জন দেয়া দূরে থাকুক, তিনি তাঁর দ্বন্দ্ব-মুক্ত আনন্দময় অধ্যাত্ম নিশ্চয়তা পেয়েছিলেন ঐতিহ্য সূত্রে।

ভারতীয় কাব্যে তথা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে 'ট্র্যাজেডি' নেই বলে ইয়েটস অভিযোগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের স্বভাবে গভীর দ্বন্দ্ব ছিল কিনা, থাকলে তা কতখানি প্রকাশ পেয়েছে,[২৩] এ বিতর্কে না গিয়েও বোধহয় বলা চলে, বেদান্ত দর্শনের প্রবণতা অনুযায়ী তাঁর মন দ্বন্দ্ব ও দ্বৈতকে ততটা স্বীকার করেনি যতটা করেছে ঐক্যকে। তাই তাঁর কাব্যে কোনও মৌল, কোনও আত্যন্তিক বিরোধ প্রকাশ পায় নি। তাই তিনি ইডিথ সিটওয়েলের মত রাসভ চর্মাবৃত বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের রাসভ চীৎকারে (!) কেইন ও আবেলের কলহ শুনতে পাননি,[২৪] কিংবা ইয়েটসের মত মানুষের স্বভাবের ভেতরকার ক্ষয়হীন weasel's tooth[২৫] দেখতে চান নি। পত্রপুটের 'পৃথিবী' কবিতায় তিনি 'বিপরীত' মানুষের জীবনের 'দুঃসহ দ্বন্দ্ব' এবং 'শুভ-অশুভে'র কথা বলেছেন। এগুলো তাঁর কল্পনায় অতি সামান্য স্থান অধিকার করেছিল। এমনকি তিনি যখন পৃথিবীর ইতিহাসের সেই 'আদিম বর্বরের' কথা বলেন যা 'স্বভাবের কালো গর্ত থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসে এঁকে বেঁকে তখনও মনে হয় না যে এ কুটিল সরীসৃপ (আপাততঃ জয়ী হলেও) অমর; কিংবা তাকে দেবতারা বিবর্তনের আরো কয়েক ধাপ পরে নিঃশেষে সংহার করতে পারবে না। অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের গোটা কাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলার উপায় নেই যে এ

'নাগদানবের' হাতে শুভের অন্তিম পরাজয় তিনি মেনে নিয়েছিলেন, তাঁর কল্পনা অশুভের উপর বেশীক্ষণ নিবদ্ধ থাকতে পারে নি। 'শিশুতীর্থে' তাঁর অশুভকল্পনার বাস্তবতা যে প্রত্যয় সৃষ্টি করে তাঁর শুভ সম্ভাবনার চিত্র মোটেই তা করে না। তবুও কবিতাটির শেষ শুভে। 'পশুই শাশ্বতঃ' এ কথা পাঠক ভুলতে না পারলেও কবিতার শেষে কবি ভুলে যান। সাধারণভাবে এ সত্য যে দ্বন্দ্ব দেখে রবীন্দ্রনাথ পীড়িত হন, অশুভ দেখে তিনি মানুষের জন্যে উৎকণ্ঠিত হন, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুল প্রার্থনায় তাঁর দ্বন্দ্ব ও অশুভবোধ তলিয়ে যায়।

ইয়েটসও গভীর ভাবে ঐক্য কামনা করেছেন, কিন্তু সে এক অবাস্তবায়িত সুদূর সম্ভাবনা মাত্র। তাঁর কাব্যে বৃত্ত একীভূত সত্যের প্রতীক। এ দৃশ্যমান অব্যবস্থাপিত বিশ্বের ব্যাপার নয়, খুব বিরল মুহূর্তে মানুষের অভিজ্ঞতায় এ ধরা পড়ে। তাই তিনি কল্পনা করেছেন বৃত্তের ভেতর দু'টী পরস্পর অনুবিদ্ধ বিপরীতমুখী গতি যার একটী অপরটির সাথে বিরামহীন দ্বন্দ্বে লিপ্ত। এ দ্বন্দ্ব নিয়মে বাঁধা, এক পক্ষের শক্তি যখন বাড়ে অন্য পক্ষের শক্তি তখন হ্রাস পায়, পর্যায়ক্রমে এ চলতে থাকে। হয়ত কোনও অনন্তে এ দ্বন্দ্বের অবসান হবে। কিন্তু পার্থিব সীমায় চেতনার অর্থ দ্বন্দ্ব,[২৬] আর দ্বন্দ্ব মানুষের স্বভাবে, আত্মিক জীবনে এবং সভ্যতার ইতিহাসে। 'আমরা বাঁচতে শুরু করি, যখন থেকে জীবনকে ট্র্যাজেডি বলে ভাবি।'[২৭] তাঁর 'There' কবিতায় আমরা পড়ি :

There all the serpent-tails are bit.[২৮]

কিন্তু ভুজঙ্গিনী প্রকৃতি মুখ দিয়ে ল্যাজ স্পর্শ করে যে বৃত্ত সৃষ্টি করে তা জীবনায়ত্ত নয়, অভীপ্সিত মাত্র ; যা আপাততঃ বাস্তব এবং যা তিনি সাগ্রহে এবং সানন্দে গ্রহণ করেছেন তা হল :

the frog spawn of a blind man's ditch
A blind man battering blind men.[২৯]

কী হিংস্র আর আবেগময় বিরোধের চিত্রকল্পে কবির অন্ধ জীবন ক্ষুধা প্রকাশ পেয়েছে। ইয়েটস দ্বন্দ্বকে চিন্তার, অভিজ্ঞতার, ব্যক্তির এবং বিশ্বের সব সম্পর্কের মূলনীতি বলে গ্রহণ করেছিলেন ; অভিজ্ঞতার রূপায়ণেও তিনি দ্বন্দ্বের কাঠামোকে বার বার ব্যবহার করেছেন। এমন কি দ্বন্দ্বের সূত্র ধরে তাঁর কাব্যে পরিণতি এসেছিল। প্রথম থেকেই ইয়েটস দুরকমের মূল্য বোধের মধ্যে বিরোধ দেখেছিলেন : একদিকে

অক্ষয় সৌন্দর্য, প্রেম, সত্তার মুক্তি ও স্বতঃস্ফূর্ততা, অন্যদিকে ক্ষয়, বাধা, বিচ্ছেদ, বিশ্লেষণ। কিন্তু রেখার অস্পষ্টতায়, ভাষার অবসন্নতায় এবং ঘুম ঘুম ছন্দের ওঠা পড়ায় তাঁর পলায়নী কাব্য মরজগতকে কার্যতঃ অস্বীকার করেছিল। যখন থেকে কাব্যিক স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে ইয়েটসের রচনায় বস্তুজগত অপর জগতের মুখোমুখী হল, অর্থাৎ যখন থেকে এ দুই জগতের সম্পর্ক দ্বন্দ্বময় হয়ে উঠল, তখন থেকে তাঁর কবিতা পেল রৌদ্র-উদ্ভাসিত পৃথিবীর তীক্ষ্ণতা এবং জ্যা-অাঁটা ধনুকের দৃঢ়তা। আত্মপ্রকাশকামী কবি-নায়ক নিজ সত্তা ও বস্তুর সংঘাতবেগ থেকে পেলেন বস্তুকে অতিক্রম করার শক্তি। বৃত্তের যে ভগ্নাংশে মানুষের অস্তিত্ব তার কোনও অনুভূতি বা অবস্থার কথাই ইয়েটস ভাবতে পারেননি সংশ্লিষ্ট বিপরীতকে সামনে দাঁড় না করিয়ে। ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটিও যে রবীন্দ্রকাব্যের সরল আত্মসমর্পনের সম্পর্ক নয়, বরঞ্চ এক ধরণের বৈরিতার সম্পর্ক তা আমরা যথাস্থানে দেখতে পাব। অবশ্য একটু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে যে বিপরীতের মধ্য দিয়ে ইয়েটস নিরন্তর পরিপূরককে খুঁজেছেন, সুতরাং সব বিরোধকে জ্ঞানের ও জীবনের অঙ্গীভূত করে ঐক্যকে আয়ত্ত করতে চেয়েছেন। দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ঐক্য আসবে এ আশা তিনি এক সময় করতেন। তাঁর ক'টি পংক্তি প্রসঙ্গচ্যুত করে এখানে বলা চলে ঃ

For nothing can be sole or whole  
That has not been rent.[৩০]

ইয়েটসীয় দ্বন্দ্ব জীবনে একই সঙ্গে সৃষ্টিশীল ও বিধ্বংসী, শিল্পে সম্পূর্ণ সৃষ্টিশীল ; তা এত মূল্যবান বলেই তিনি ট্র্যাজিক অনুভূতির পরিমাপে জীবনের মূল্য নিরূপণ করছেন, কিন্তু এ দ্বন্দ্বের অনবসানতা অসম্পূর্ণতাবোধকে অনতিক্রম্য করে তাঁর জীবন চেতনাকে গভীরতর অর্থে বিয়োগান্ত করে তুলেছিল।

ইয়েটসের সঙ্গে তুলনায় রবীন্দ্রনাথের ঐক্যবোধ যে অনায়াসলব্ধ, এবং সে কারণে তাঁর দ্বন্দ্ববোধ যে তীক্ষ্ণ হতে পারে নি, তা বোধ হয় অনস্বীকার্য। ইয়েটস একবার বলেছিলেন ঃ 'প্রাচ্যের কাছে সব কিছুর সমাধান আছে, তাই সে ট্র্যাজেডি কাকে বলে জানে না।'[৩২]

অধ্যাপক বসুর কাছে ইয়েটস ভারতবর্ষকে যে বাণী দিয়েছিলেন তাতে আরও প্রমাণ হয় যে তিনি হিংসায় বিশ্বাসী ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর মনোভাবকে নাটুকে এবং একটু 'কাব্যিক' বলে ধরে নেওয়ার লোভ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু

তাঁর হিংসার একটা দার্শনিক, অন্তত ভেষজতাত্ত্বিক, ভিত্তি ছিল। তাঁর জীবনের সর্বশেষ কবিতার তিনি লিখেছেন ঃ

> You that Mitchel's prayer have heard,
> Send war in our time, O Lord!
> Know that when all words are said
> And a man is fighting mad,
> Something drops from eyes long blind
> He completes his partial mind.[৩৩]

সুতরাং পূর্ণতার জন্যে দ্বন্দ্ব এবং হিংসার প্রয়োজন আছে। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের কাছে এ দর্শন গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হত না।

ডাবলিন ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে রক্ষিত হোনের কাগজপত্রাদি থেকে জানা যায় রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর বিষয়ক কবিতার অস্পষ্টতা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে ইয়েটস আরও একটু মন্তব্য করেছিলেন। তিনি ভারতীয় কবির সঙ্গে নিজের তুলনা করে বলেছিলেন যে তাঁর কবিতায় সব সময় তাঁর লক্ষ্য ছিল স্পষ্ট চিন্তা ও যুক্তিসহ নিখুঁত প্রকাশ। ইয়েটস নিজের সম্পর্কে যে দাবী করেছেন তা' অস্বীকার করা সম্ভব নয়; তবে এ কথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথ ও ইয়েটসের ঈশ্বরবোধ এক ধরনের ছিল না। একজন পরম সুন্দরের লীলাকে অন্তর্লোকে ও বহির্লোকে প্রতিক্ষণে প্রত্যক্ষ করেছেন, নানারূপে নানা বর্ণচ্ছটায় তাঁর প্রকাশ দেখতে পেয়েছেন, আনন্দে প্রেমে শংকায় তাঁকে আপন অস্তিত্বে উপলব্ধি করেছেন। আর একজন কাব্যের ধ্বনি ও মিলের খাতিরে ঈশ্বরের মহিমাকে প্রয়োজন মত কমিয়েছেন বাড়িয়েছেন, কখনও জ্যামিতিক-নন্দনতাত্ত্বিক কারণে-তঁরে বিশ্বকল্পনাকে পূর্ণতা দেয়ার জন্যে সৃষ্টিকর্তাকে 'ত্রয়োদশ সূচী ঘন ক্ষেত্র' [redacted] বলে অভিহিত করেছেন, কখনও বা তঁাকে প্রতিপক্ষ হিসেবে গ্রহণ করে, বিরোধের মধ্য দিয়ে, একটু নিকটতর সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। কিন্তু ঘোর অহংবাদী ইয়েটস রবীন্দ্রনাথের মত ঈশ্বরের সঙ্গে কোনও মন্ময় সম্পর্ক স্থাপন করেন নি। এ কারণে তাঁর কবিতায় ঈশ্বর মন্ময় অনুভূতির অস্পষ্টতা থেকে মুক্ত, তাঁর উল্লেখ অতি সতর্ক, সুবিবেচিত এবং রবীন্দ্রকাব্যের তুলনায় বিরল। ইয়েটস দু একবার মরমী অভিজ্ঞতার দাবীও করেছেন।[৩৪] একবার তাঁর 'আত্মা'-সচেতন অহঙ্কারকে বিসর্জন দিয়ে স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পনও করেছেন, কিন্তু এ সব ব্যতিক্রম

মাত্র। তবে এ সব ক্ষেত্রেও তার প্রকাশ সুস্মিত, ব্যঞ্জনাময় অথচ স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের কাছে ঈশ্বর সূর্যকর কিংবা বাতাসের মতো, তাঁকে তিনি এড়াতে পারেন নি—এড়াতে চানও নি ; তাঁর চেতনা কখনো ঈশ্বরশূন্য হয় নি ; তাঁর দীর্ঘ জীবনের কাব্য সাধনায় তাই ঈশ্বর নানা বেশে উপস্থিত।[৩৬] ইয়েটস রবীন্দ্রকাব্যের অতি পরিমিত অংশের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সুতরাং তাঁর সমালোচনার যেটুকু যথার্থ তা হল এই যে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরানুভূতির সব প্রকাশে 'আবেগের চাপ', 'বিশ্বাসের উত্তাপ', ব্যঞ্জনার প্রাখর্য, সমানভাবে উপস্থিত ছিল না, এবং এ কারণে তা কাব্যিক বিচারে সমান সার্থক হয় নি। 'বলাকা'র কবি উচ্চাঙ্গের দার্শনিক মননে সক্ষম এ কথা হয়তো ইয়েটস জানতেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের বিস্ময়কর পরিণতি, তাঁর মননের দৃঢ়তা, আবেগের সংযম, ভাষার নির্মম মিতাচার এবং ব্যঞ্জনার তীক্ষ্ণতা ও জটিলতা, এ সব তিনি কি করে জানবেন? প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে নিরাভরণতা অর্থগাঢ়তা ও সংহত শক্তির দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্য ইয়েটসের পরিণত রচনার সঙ্গে তুলনীয়। এখানে এও বলে রাখা উচিত যে এ অংশের মতামতের ভিত্তি কেবল রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং এ মতামত তাঁর গদ্যরচনা ও নাটক দ্বারা পুরোপুরি সমর্থিত হয় কিনা সে বিষয়ে আলোচনার অবকাশ আছে।

ইয়েটসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল দেখাতে গিয়ে কেউ কেউ আইরিশ কবির প্রথম দিকের কোনও কোনও কবিতার উল্লেখ করেন। কিন্তু ১৯৩৪ সালে, অর্থাৎ অধ্যাপক বসুর সঙ্গে কথোপকথনের তিন বছর আগে, ইয়েটস 'Ribh Considers Christian Love Insufficient' কবিতাটি লেখেন। কবিতাটির ভাবের কাঠামো অনন্য এবং এর শেষ স্তবকের চিন্তা ও অনুভবের ভঙ্গি বিস্ময়করভাবে রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি, এবং তাঁকে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেয়।

কবিতাটির নামের মধ্যে খৃষ্টীয় প্রেমের মূল্যায়ন স্পষ্ট। ইয়েটস এর কারণ দিয়েছেন অন্য আরেকটি কবিতায় : মানুষ শুধু বংশবৃদ্ধি করে চলেছে আর ঈশ্বর মাত্র তিন, তার কারণ মানুষ ঈশ্বরের মত ভালবাসতে পারে না। মানুষের প্রেম উত্তাপ ও তীব্রতা হারায় উত্তাপহীন দেহ কিংবা মনের স্পর্শে, তাই বিশ্বময় পুনরাবৃত্তির এ ঘটা, প্রকৃতিতে সংখ্যার এ বাড়াবাড়ি। আলোচ্য কবিতায় ইয়েটস খৃষ্টীয় প্রেম ছাড়া আধুনিক গণকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের মন ও দেহহীন নৈর্ব্যক্তিক প্রেমেরও সমালোচনা

করেছেন। সবার উপরে 'ঘৃণা'কে ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভের উপায় বলে তিনি গ্রহণ করেছেন। ইতির জন্যেই নেতি, এ নেতির প্রকাশ নায়কের অতি সবল অতি সচেতন আমিত্বে উগ্র; কিন্তু সব মানবিক সম্পর্ক, কর্ম, ভয় ও ছলনাকে বর্জন করে, সব 'দৈহিক ও মানসিক আসবাব' পরিত্যাগ করে, নেতির গভীর থেকে গভীরে পৌঁছে 'আমি' আবিষ্কার করল ইতিকে, আর অমনি উদ্বেল আত্ম-সমর্পণে নত হল ভগবানের কাছে। কবিতাটির সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি প্রয়োজন:

Why should I seek for love or study it?
It is of God and passes human wit.
I study hatred with great diligence,
For that's a passion in my own control,
A sort of besom that can clear the soul
Of everything that is not mind or sense.

Why do I hate man, woman or event?
That is a light my jealous soul has sent.
From terror and deception freed it can
Discover impurities, can show at last
How soul may walk when all such things are past,
How soul could walk before such things began.

Then my delivered soul herself shall learn
A darker knowledge and in hatred turn
From every thought of God mankind has had.
Thought is a garment and the soul's a bride
That cannot in that trash and tinsel hide!
Hatred of God may bring the soul to God.

At stroke of midnight soul cannot endure
A bodily or mental furniture.
What can she take until her Master give!
Where can she look until He make the show!
What can she know until He bid her know!
How can she live till in her blood He live![৩৭]

তৃতীয় স্তবকের ঈশ্বর বিদ্বেষের ভঙ্গিমাটি লক্ষণীয়। আরও লক্ষণীয় ইয়েটসের আকস্মিক আত্মসমর্পন। এ কবি নিজেকে সৃষ্টিকর্তার সমান না হলেও তাঁর প্রায় কাছাকাছি বলে মনে করতেন; তিনি শঙ্করাচার্যের মত

আপোষহীন ঐক্যবাদী ছিলেন, সুতরাং আত্মা ও পরমাত্মা, বিষয় ও বিষয়ী, প্রার্থনাকারী ও প্রার্থনা শ্রবণকারীর মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখতে চান নি। শুধু এ কবিতাটি এর ব্যতিক্রম। এখানে তিনি স্রষ্টার কাছে বিনম্র প্রার্থী।

বলা বাহুল্য, শেষের পংক্তি কটির সুর এবং 'গীতাঞ্জলি'র সুর এক এবং এ আত্মসমর্পণের ভাব 'গীতাঞ্জলি'র পাতায় পাতায় ছড়ানো। এখানে ইয়েটসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শব্দগত মিল থাকা নিষ্প্রয়োজন। ইয়েটস ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক তাগিদ ও প্রেরণায় এ কবিতা লিখেছিলেন, যদিও এ তাঁর ভাবজীবনের এক বিশেষ আবহাওয়ায় রচিত। এ আবহাওয়া তৈরী করতে সাহায্য করেছিল বার্দ্ধক্যের প্রশ্নসঙ্কুল মন, পুরোহিত স্বামীর দর্শন এবং তাঁর সাহচর্য। আরও প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে স্মরণযোগ্য যে, পুরোহিত স্বামী এবং রবীন্দ্রনাথ দু'জনেই প্রার্থী ও প্রভুর দ্বৈত স্বীকার করতেন। তাই ইয়েটসের মন যখন প্রার্থনা এবং নিবেদনে আকুল ও আর্দ্র হল তিনি প্রায় 'গীতাঞ্জলি'র কবির ভাষায় কথা কয়ে উঠলেন।[৩৮]

অবশ্য এই দুই কবির প্রকৃতি এত ভিন্ন যে তাঁদের সাদৃশ্য তাঁদের বৈসাদৃশ্যের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। রবীন্দ্রনাথ ইয়েটস থেকে কিছু গ্রহণ করেন নি, এবং ইয়েটসও উল্লিখিত ব্যতিক্রম ছাড়া রবীন্দ্রনাথ থেকে এমন কিছু লাভ করেন নি যা তাঁর কবিতায় আঙুল দিয়ে চিহ্নিত করা যাবে। রবীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর ইয়েটস রদেনস্টাইনকে লিখেছিলেন যে তিনি তাঁর থেকে নিজ শিল্পে অনুপ্রেরণা পান।[৩৯] তার অর্থ এ নয় যে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় তাঁর মতো কবিতা লিখতে উদ্যোগ করেছিলেন। কোনও বড় কবি তা করেন না, ইয়েটসের মত স্বনিষ্ঠ মহৎ কবির বেলায় তো তা একেবারেই অচিন্তনীয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়ের সময়ে ইয়েটস আপন নির্দিষ্ট পরিণতির পথে দৃঢ়পদে অগ্রসরমান। তখন তাঁর বিশ্রুত 'cold and passionate' রীতি সূচিত হয়ে গেছে, যাতে 'রক্ত, কল্পনা এবং বুদ্ধি' একসঙ্গে প্রবহমান। রবীন্দ্রনাথ ইয়েটসের কয়েকটি সাংস্কৃতিক অভীপ্সা এবং আধ্যাত্মিক প্রত্যয়কে স্পষ্ট এবং শক্তিশালী করা ছাড়া তাঁর কাব্যে কিছু যোগ করেন নি।

আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ভারতীয়দের সাথে আইরিশ কবির পরিচয় সার্থক হয়েছিল এভাবে। পরিণামে ইয়েটস জীবনের মধ্যে সত্যকে অনুভব করে বস্তুর

অন্তরে আত্মাকে দেখেছিলেন, এবং এ কারণে একদিকে বস্তুর একাধিপত্য দৃপ্তকণ্ঠে অস্বীকার করেছেন, আর অন্যদিকে তাঁর অতিবস্তুবিহারী কল্পনাকে বস্তুর মর্মোদ্ঘাটনে নিয়োগ করেছেন, তাঁর কাব্যের মূল জীবনে ও ঘটনায় দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন। বস্তু ও আত্মায় কোন ছেদ নেই, প্রতীক ও প্রতীকাতীত শেষ পর্যন্ত এক—Natural and supernatural with the self-same ring are wed[৪০]—এ কথা যখন ইয়েটস বুঝতে পারলেন, বস্তুর প্রতি তাঁর অনুরক্তি বাড়ল, সেই সঙ্গে তাঁর কবিতা হয়ে উঠল অসাধারণ স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল। অবশ্য এ জন্যে ইয়েটসের কোন ব্যক্তিবিশেষ বা উৎসবিশেষের কাছে ঋণ স্বীকারের প্রশ্নই উঠে না, কেননা এ বোধ তাঁর সারাজীবনের অভিজ্ঞতা উপলব্ধি পড়াশোনা, এক কথায় তাঁর জটিল কাব্যজীবনের পরিণতির ফল।

তাঁর উত্তরজীবনে ইয়েটসের কাছে প্রাচী এবং প্রতীচি মানুষের মনের কতগুলো স্থায়ীগুণ বা প্রবণতার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। প্রাচীর আকর্ষণীয় দিক তার 'সারল্য', 'স্বাভাবিকতা', 'ঐতিহ্যবোধ', 'আনুষ্ঠানিকতা', আর তার মন্দ দিক তার 'আকারহীনতা', 'অস্পষ্টতা', 'অমূর্ততা', 'আত্মনিগ্রহ', ও 'আত্মসমর্পণেচ্ছা'। প্রতীচির বৈশিষ্ট্য তার দেহীজীবন, বাস্তবতা, 'আক্রমণমুখিতা', তার কল্পনার সুব্যক্ত রূপময়তা এবং ইতিহাসে অসীমের প্রকাশে গুরুত্বদান। এ গুণগুলো ভৌগোলিক হলেও দেশকাল নির্বিশেষে যে কোনও দেশে যে কোন কালে দেখা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ইয়েটস প্রাচ্যের প্রায় সব ক'টি চিত্তাকর্ষক গুণ দেখতে পেয়েছিলেন, এবং এ জন্যে শেষ অবধি তাঁকে মূল্য দিয়েছেন।

১৯৩১ সনে ইয়েটস রবীন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন: 'আপনার কবিতা আমাকে উদ্দীপ্ত করে। গত কয়েক বছর আপনার গদ্য রচনায়, "ঘরে বাইরে" "জীবনস্মৃতি" গল্প ইত্যাদিতে প্রজ্ঞা ও সৌন্দর্য দুই-ই দেখতে পেয়েছি। আপনার সঙ্গে যখন দেখা তার পরে আমি বিয়ে করেছি, আমার দু'টি ছেলে মেয়েও আছে। আমি এখন জীবনের সঙ্গে নিবিড়তর ভাবে যুক্ত বোধ করি। যা জীবন নয়, যা জটিল গ্রন্থি, যা যান্ত্রিক, তা থেকে নিজেকে যখনই আমি আলাদা করে দেখেছি তখনই জীবন আমার কল্পনায় এশীয় রূপ নিয়েছে। এই রূপ আমি প্রথম দেখতে পাই আপনার বইগুলোতে, পরে কতগুলো চীনা কবিতায় এবং জাপানী লেখকের গদ্য রচনায়। আপনার কবিতা যখন প্রথম পড়ি কী উদ্দীপনাই না অনুভব করেছিলাম, মনে হয়েছিল এ যেন মাঠ আর নদী থেকে বেরিয়ে এসেছে তাদের অপরবির্তনীয় সুষমা নিয়ে।'[৪১]

কেউ হয়তো বলবেন, এ চিঠির পরও তো রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও কবিতা সম্পর্কে ইয়েটস অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এর জবাবে বলা চলে যে রবীন্দ্রনাথের যে গুণ তাঁকে আকর্ষণ করেছিল তার সম্পর্কে তাঁর কখনও মত বদলাতে হয়নি—অন্ততঃ তার কোনও প্রমাণ নেই—কেননা আইরিশ কবির কাছে এ সাহিত্যের এক বহুপ্রার্থিত গুণ।

আরও মনে রাখতে হবে যে ইয়েটস জীবনের এশীয় রূপের অন্বেষণ করলেও তিনি এশিয়াকে ভয়ও করতেন। কারণ প্রাচী ও প্রতীচি পরস্পরের প্রতিপক্ষ, তারা মানবজীবনের অন্তিম বৈপরীত্যের বিশাল ভৌগোলিক প্রতিভূ। কালের যে অমোঘ আবর্তনে ইয়েটস বিশ্বাস করতেন, তার ফলে তারা নিকটবর্তী হতে পারে, এশিয়া য়ুরোপীয় হতে পারে, য়ুরোপ এশীয় হতে পারে—নিজ নিজ সত্তা অক্ষুন্ন রেখে কিংবা একে অন্যকে গ্রাস করে। দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি শেষ জীবনে ইয়েটসকে বিচলিত করেছিল। তাঁর ধারণায় য়ুরোপের গৌরবোজ্জ্বল কীর্তি সম্ভব হয়েছে এশিয়াকে দমন করে—খৃষ্টধর্মের 'নিরাবয়ব অন্ধকারকে'[৪২] অনুপাতে রেখায় আলোতে সীমিত চিহ্নিত ও মূর্ত করে। তিনি বিশ্বাস করতেন সালামিসের নৌ যুদ্ধে এশিয়ার 'আকারহীন বিশালত্ব'কে পরাজিত করেছিল গ্রীসের নৌশক্তি নয়, পাইথেগোরাসের গণিতের উপর প্রতিষ্ঠিত ফিডিয়াসের ভাস্কর্যের অনুপ্রেরণা। এশিয়ার অন্ধকার গর্ভাশয় থেকে নির্গত হয়ে সুবিন্যস্ত গ্রীক-রোমক সংস্কৃতিকে বিপর্যস্ত করেছিল বলে ইয়েটস খৃষ্টধর্মকে কখনও প্রীতির চোখে দেখেন নি। অপরদিকে তিনি বাইজেন্টীয় ও রিনেসাঁস যুগের শিল্প ও স্থাপত্যের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত ছিলেন অন্যান্য কারণের মধ্যে এ কারণে যে তাতে তিনি অতীন্দ্রিয় ও অবিমূর্তকে দেখেছেন অবয়বে তীক্ষ্ণ ও দ্যুতিমান।[৪৩] য়ুরোপীয় শিল্প সাহিত্যের প্রকৃতি ও প্রবণতা লক্ষ্য করে ইয়েটস শঙ্কিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে আবার বুঝি য়ুরোপের মনে একটা এশীয় বিপর্যয় ঘনিয়ে আসছে, প্রাচীর মন্দ দিক বুঝি প্রতীচ্যের ভালো দিককে গ্রাস করবে। এ যুগের তিনটি প্রতিনিধিত্বমূলক রচনায়, জয়েসের 'ইউলিসিস', ভার্জিনিয়া উলফের 'ওয়েভস' এবং এজরা পাউণ্ডের 'ক্যাণ্টোজ'-এ ইয়েটসের মতে 'অভিজ্ঞতার প্লাবন যেন ভেঙে পড়ছে সমস্ত রেখা ও রঙের সীমা গুলিয়ে'। তাঁর মনে হয়েছে এ নতুন সাহিত্যে 'মানুষ কিছুই নয়।'[৪৪] বলা বাহুল্য এ পরিস্থিতি তাঁর কাছে মনে হয়েছে এশীয়। সুতরাং শঙ্কা এবং আত্মরক্ষার তাগিদে তিনি তাঁর য়ুরোপীয় ঐতিহ্য সংস্কার ও সত্তার উপর

উগ্রভাবে জোর দিয়েছেন; সেই সঙ্গে তিনি মানুষের মূল্যহানি ও সচেতন মনের কর্তৃত্ব হারানোকে, অস্পষ্টতা সৃষ্টি ও সাধারণীকরণের প্রবণতাকে, তিরস্কার করেছেন। অস্পষ্টতার অপরাধে এ তিরস্কারের কিছু অংশ রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যেও জুটেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি ইয়েটসের অসহিষ্ণুতাকে এ পরিপ্রেক্ষিতেই বুঝতে হবে।

১ রবীন্দ্র-জীবনকথা, কলিকাতা, ১৯৬০, পৃ. ১১৫।
২ *Autobiographies*, London, 1955, p. 333.
৩ 'The Pathway', *Collected Works*, Stratford, 1908, Vol. VIII, p. 195.
৪ *Autobiographies*, p. 92.
৫ John Eglinton, *A Memoir of A. E.*, London, 1937, p. 20.
৬ *Pages From a Diary Written in* 1930, Dublin, 1944, pp. 49-50.
৭ 'The Pathway', *Collected Works*, Vol. VIII. p. 191.
৮ *A Vision*, London, 1925, p. 251.
৯ *Gitanjali*, London, 1943, p. xx.
১০ Ibid., pp. XIII-XIV
১১ Ibid., p. 35.
১২ Ibid., p. XIX.
১৩ 'The Pathway', *Collected Works*, Vol. VIII, pp. 193 & 195.
১৪ *Gitanjali*, p. 3.
১৫ Shri Purohit Swami, *An Indian Monk* (*His Life and Adventures*), London, 1932, p. XV.
১৬ Ibid., pp. XVII—XVIII.
১৭ Ibid., p. XVIII.
১৮ *The Letters of W. B. Yeats*, London, 1954, pp. 834-5.
১৯ Ibid., pp. 572-73. (ইয়েটস এডমণ্ড গসকে লিখেছেন: 'আমি ইণ্ডিয়া সোসাইটিকে বলেছি রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলো আপনার কাছে পাঠাতে। এগুলো পড়ে আপনি আমার একটা কথা ভেবে দেখবেন। আমার মতে তাঁকে আমাদের সংসদে নির্বাচিত করলে বিশেষ কল্পনাশীলতার পরিচয় দেয়া হবে। তিনি বাংলা দেশের মহান কবি, তাহলেও শুধু তাঁর ইংরেজী অনুবাদের জন্যেই তিনি নির্বাচনযোগ্য।)
২০ ঐতিহ্যানুগ জাপানী কারুকৃতির নিদর্শন এ প্রাচীন তরবারিটি ইয়েটসের প্রিয় ছিল। তিনি এটি সাটো নামক এক জাপানী ভদ্রলোকের কাছ থেকে উপহার পেয়েছিলেন। কবি তাঁর *Resurrection* নাটকটি এঁকে উৎসর্গ করেন।
২১ Joseph Hone, *W. B. Yeats*, London 1942, pp. 458-59.

২২ *Essays : 1931-36*, Dublin, 1937, p. 21.

২৩ 'সাহিত্য চিন্তা'য় শিবনারায়ণ রায় রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলাকে তাঁর অন্তর জীবনের যে গূঢ় রহস্য ও দ্বন্দ্বের প্রতিফলন বলে দাবী করেছেন তার প্রকাশ কবির ব্যবহৃত অন্য কোনও শিল্পমাধ্যমে সন্দেহাতীত রূপে স্পষ্ট নয়। এর সঙ্গে ইয়েটসের শেষ লেখার এ অকুণ্ঠ স্বীকৃতি তুলনীয় :

You think it horrible that lust and rage
Should dance attention upon my old age ;
They were not such a plague when I was young ;
What else have I to spur me into song ?

অথবা ( *The Spur* )

Those masterful images because complete
Grew in pure mind, but out of what began ?
A mound of refuse or the sweepings of a street,
Old kettles, old bottles, and a broken can,
Old iron, old bones, old rags, that raving slut
Who keeps the till. Now that my ladder's gone,
I must lie down where all the ladder's start,
In the foul rag and bone shop of the heart.

( *The Circus Animal's Desertion* )

২৪ ইয়েটস ইডিথ সিটওয়েলের 'Ass Face' কবিতাটি তাঁর *Essays : 1931-36* বইতে উদ্ধৃত করেছেন।

২৫ W. B. Yeats, *Collected Poems*, London, 1952, p. 235.

We who seven years ago
Talked of honour and of truth
Shriek with pleasure if we show
The weasel's twist, the weasel's tooth.

২৬ *A Vision*, New York, 1955, p. 214.

২৭ *The Autobiographies*, New York, 1938, p. 165.

২৮ *The Collected Poems*, p. 329.

There all the barrel-hoops are knit,
There all the serpent- tails are bit,
There all the gyres converge in one
There all the planets drop in the Sun.

২৯ Ibid., p. 262.

৩০ Ibid., p.295.

৩১ A. N. Jeffares-এর *W. B. Yeats : Man and Poet* (London 1949) দ্রষ্টব্য। এ গ্রন্থের শেষে উদ্ধৃত ইয়েটস লিখিত 'Genealogical Tree'-তে এ উক্তিটি দেখা যাবে।

৩২ *Letters on Poetry from W. B. Yeats to Dorothy Wellesley*, Oxford, 1940, p. 91.

৩৩ *Collected Poems*, p. 398.

৩৪ *A Vision*, p. 210.

৩৫ ইয়েটসের *Essays*-এ একটি মরমী অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে (পৃঃ ৫৪০), সেটি তাঁর 'Vacillation' কবিতার চতুর্থ অংশে কাব্যিক রূপ নেয় এবং 'A Dialogue of Self and Soul'-এ আবার কিঞ্চিৎ আত্মপ্রকাশ করে। অনুরূপ অভিজ্ঞতার প্রতিভাস 'Stream and Sun at Glendalough' কবিতায় দেখা যায়। ১৯৩১ সনের নভেম্বরে মিসেস অলিভিয়া সেক্‌স্‌পীয়রকে লিখিত চিঠিটিও এখানে উল্লেখযোগ্য : 'সন্ধ্যার পরে আমি একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম, কতগুলো বিরাট গাছের নীচ দিয়ে যেতে যেতে উঁচু দার্শনিক চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ি ......মনে হল হঠাৎ অবশেষে যেন আমি বুঝতে পেরেছি, তারপর গোলাপের গন্ধ পেলাম। আমি কালাতীত সত্তার প্রকৃতি এখন বুঝতে পেরেছি।" *The Letters*, p. 785.

৩৬ এর অন্যতম প্রমাণ 'উৎসর্গে'র কবিতাগুলো।

৩৭ *Collected Poems*, p. 330.

৩৮ ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি'র অনেক কথার মধ্যে এগুলো এখানে স্মরণযোগ্য :

Ornaments would mar our union,
they would come between thee and me. (7)

Thou art that truth which has kindled
the light of reason in my mind. (4)

And give me the strength to surrender
my strength to thy will with love. (36)

In my life thy will is ever taking shape. (56)

৩৯ Sir William Rothenstein, *Men and Memories*, 1900-22, London, p. 263.

৪০ *Collected Poems*, p. 328.

৪১ *The Golden Book of Tagore*, Calcutta, 1931, p. 269.

৪২ W. B. Yeats, *On the Boiler*, 1939, p. 28.

৪৩ *A Vision*, pp. 291-92.

৪৪ *Wheels and Butterflies, London*, 1934, p. 73.